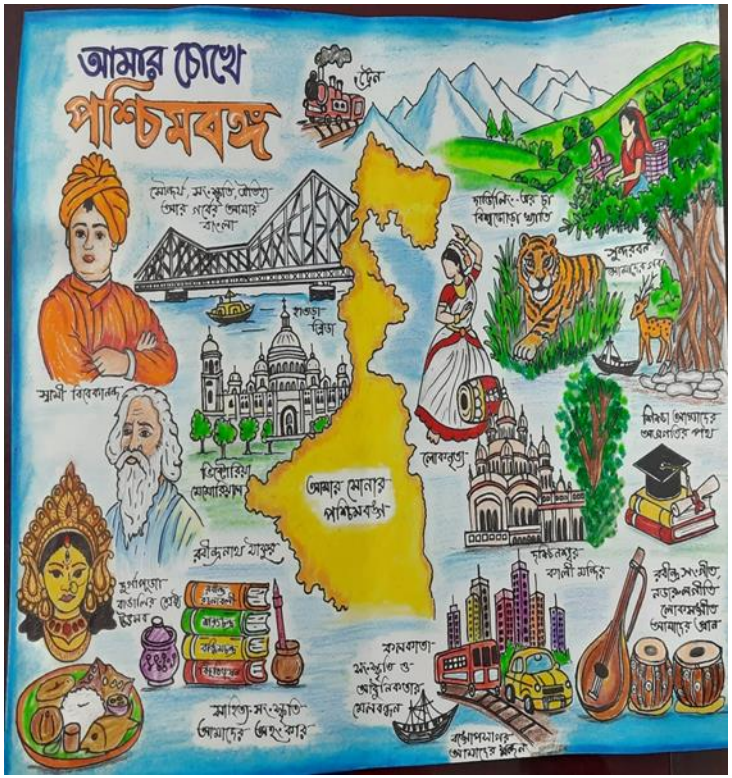

অনিন্দিতা ভৌমিক ও অঙ্কিতা ভৌমিক (কম্পিউটার সায়েন্স)

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন

স্মরণিকা

সম্পাদক

ড. নীলোৎপল জানা

মহিষাদল গার্লস কলেজ

ও

IQAC

পূর্ব মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন

উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ: ২০ জুন ২০২৬

প্রকাশক: মহিষাদল গার্লস কলেজ ও IQAC

মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর

প্রচ্ছদ: সম্পাদক

Additionally, the culture is celebrated for North Bengal's "wooden Gomira masks", hand-carved from a single block of wood by the Rajbangshi community to ward off evil spirits, and Malda's "Gambhira masks", which are used in satirical, musical folk theatre to openly critique contemporary socio-political corruption. From the ethereal, translucent "Shola (sponge wood) masks" of Murshidabad to the clay molds of Kumartuli, West Bengal's culture is internationally recognized by organizations like UNESCO as an invaluable repository of the subcontinent's living, subaltern heritage.

In short, the true power of West Bengal's "mukhosh" culture lies in how these three iconic traditions serve as the living heartbeat of rural society. Together, this powerful triad of Chhau, Gomira, and Gambhira proves that the Bengali mask is far more than a decorative craft—it is a dynamic, centuries-old medium through which marginalized communities continue to preserve their history, express their voice, and celebrate their identity on the global stage.

আমার চোখে পশ্চিমবঙ্গ মানে-মাটির গন্ধ, মানুষের ভালোবাসা, উৎসবের আনন্দ, প্রকৃতির সৌন্দর্য আর একটা নিজের ঘরের অনুভূতি।

Banga Mukhosh

Srabani Bera,
Department of English,
Semester – VI

In West Bengal, "Mukhosh culture" refers to the state's vibrant, ancient tradition of mask-making and ritualistic mask-dancing, which serves as an artistic bridge connecting rural folklore, animistic tribal roots, and Puranic mythologies. Rather than acting as mere decorative items, these masks are treated as sacred artifacts; when a folkdance puts on a *mukhosh*, it is traditionally believed that they temporarily transcend their human identity to embody the spirits, deities, or demons they represent.

The culture is globally famous for its remarkable diversity of regional craft and distinct theatrical performance styles. Most iconic among them is the "Purulia Chau mask". A heavily stylized, vibrant paper-mâché and clay creation with a massive, ornate crown of feathers and beads used in the acrobatic and martial Chau dance, which carries an official Geographical Indication (GI) tag.

পশ্চিমবঙ্গবাসী-হিসাবে গর্বিত

অধ্যক্ষ, ড. অঞ্জলি মণ্ডল
মহিষাদল গার্লস কলেজ

নমস্কার!

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের এই শুভক্ষণে, আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। আজ যখন এই দিনটি উদযাপন উপলক্ষে আমরা বদ্ধপরিকর, তখন আমরা কেবল পঞ্জিকার একটি তারিখই চিহ্নিত করছি না; আমরা আমাদের এই মহান রাজ্যের সহনশীলতা, ত্যাগ এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মানও জানাচ্ছি।

পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই ভারতের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক শক্তির কেন্দ্র। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক প্রতিভা থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্ম, রাজা রামমোহন রায় এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সামাজিক সংস্কারে সমৃদ্ধ। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং উৎসব, বিশেষ করে দুর্গাপূজার মহা সমারোহ, বিশ্বজুড়ে অনুরণিত হয়। আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বৌদ্ধিক জাগরণের অগ্রভাগে থাকার এক ঐতিহ্য বহন করি।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের প্রধান উদ্দেশ্য হল আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে গর্ব ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। এটি আমাদের অভিন্ন ইতিহাস নিয়ে ভাবা, ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করা এবং সামাজিক সংহতি জোরদার করার একটি দিন। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, আমরা এক অভিন্ন ঐতিহ্য এবং বাংলার প্রতি অভিন্ন ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ।

যে ঐতিহাসিক মাইলফলকগুলো আমাদের ভাগ্যকে গড়ে তুলেছে, সেগুলোর দিকে ফিরে তাকানোর পাশাপাশি আসুন আমরা ভবিষ্যতের দিকেও তাকাই। আমরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করি, যাতে আমাদের রাজ্য বিশ্বমঞ্চে উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হতে থাকে। ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের ভাষাও খুব মজার। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলে কথার টান বদলে যায়। গ্রামের ভাষা, শহরের ভাষা, উত্তরবঙ্গের ভাষা-সবকিছুর মধ্যেই আলাদা একটা মাধুর্য আছে। এই আঞ্চলিক ভাষাগুলোই আমাদের সংস্কৃতিকে আরও জীবন্ত করে রেখেছে।

তবে আমার চোখে পশ্চিমবঙ্গের কিছু সমস্যাও আছে। আমাদের রাজ্যে অনেক ভালো ছেলে-মেয়ে আছে, কিন্তু সবার জন্য পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ নেই। অনেককে কাজের জন্য বাইরে যেতে হয়। গ্রামের দিকে এখনো অনেক জায়গায় ভালো শিক্ষা, চিকিৎসা আর সুযোগ-সুবিধার অভাব আছে। আমাদের আরও শিল্প গড়ে তুলতে হবে, নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

আমাদের প্রকৃতির দিকেও নজর দিতে হবে। জঙ্গল, নদী, পশুপাখি-এসব শুধু দেখার জিনিস নয়, এগুলো আমাদের সম্পদ। সুন্দরবন, অভয়ারণ্য, বনাঞ্চল রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। যদি আমরা প্রকৃতিকে নষ্ট করি, তাহলে ভবিষ্যতে তার ক্ষতি আমাদেরই ভোগ করতে হবে।

আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক সম্ভাবনা আছে। আমাদের পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে, কৃষি আছে, সংস্কৃতি আছে, প্রতিভাবান মানুষ আছে। শুধু দরকার এগুলোকে ঠিকভাবে ব্যবহার করা। পর্যটন বাড়াতে হবে, কৃষিতে নতুন পদ্ধতি আনতে হবে, ছোট ব্যবসা ও শিল্পকে সাহায্য করতে হবে। আমাদের নিজের রাজের সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে।

আমার চোখে পশ্চিমবঙ্গের ভালো আর খারাপ-দুটোই আছে। কিন্তু সবকিছুর পরেও এই রাজ্যের প্রতি একটা আলাদা টান আছে। কারণ এই রাজ্য শুধু থাকার জায়গা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের স্মৃতি, আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি আর আমাদের ভালোবাসা।

জীবনের অংশ। কিন্তু এই বাঙালিই যখন কোনো কাজে মন দেয়, তখন নিজের বুদ্ধি আর প্রতিভার পরিচয় দেয়।

বাঙালির একটা বিশেষ জিনিস হলো তার চিন্তাশক্তি। আমরা যেকোনো বিষয় নিয়ে ভাবতে ভালোবাসি, প্রশ্ন করতে ভালোবাসি। সাহিত্য, গান, বিজ্ঞান, শিক্ষা-সব ক্ষেত্রেই বাঙালির অবদান আছে। আমাদের মধ্যে অনেক সময় পরিশ্রমের চেয়ে বুদ্ধির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। এই বুদ্ধি আর সৃজনশীলতাই বাঙালির আসল শক্তি।

বাঙালির সংস্কৃতির মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠানও একটা বড় জায়গা ধরে আছে। আমাদের বাড়ির বিয়ে মানেই শুধু ছেলে-মেয়ের বিয়ে নয়, পুরো পরিবারের একটা উৎসব। বিয়ের আগে গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত, আত্মীয়-স্বজনের আসা, বাড়িতে আনন্দ-সবকিছু মিলিয়ে একটা আলাদা পরিবেশ তৈরি হয়। বিয়ের দিনে শঙ্খের আওয়াজ, উলুধ্বনি, মালাবদল, সিঁদুর পরানো-এসবের মধ্যে একটা পুরোনো ঐতিহ্য লুকিয়ে আছে।

এখন সময় বদলেছে, বিয়ের ধরনও বদলেছে। অনেকে আধুনিকভাবে বিয়ে করছে, কিন্তু তারপরও বাঙালির পুরোনো রীতিগুলো এখনো অনেক জায়গায় দেখা যায়। বাঙালির বিয়েতে খাবারের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। মাছ, ভাত, মিষ্টি, দই-এসব ছাড়া যেন বাঙালির অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না। অতিথিদের আপ্যায়ন করার মধ্যেও বাঙালির মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের উৎসবগুলোও আমাদের জীবনের বড় অংশ। দুর্গাপূজা এলে মনে হয় পুরো বাংলা নতুন করে জেগে ওঠে। পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল, আলো, মানুষের ভিড়, নতুন জামাকাপড়, খাওয়া-দাওয়া-সব মিলিয়ে এক অন্যরকম আনন্দ। তবে শুধু দুর্গাপূজা নয়, সরস্বতী পূজা, কালীপূজা, নববর্ষ, ঈদ, বড়দিন-সব উৎসবেই মানুষ একসঙ্গে আনন্দ করে। এটাই আমাদের বাংলার সৌন্দর্য।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ড. নীলোৎপল জানা

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ এবং জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা যোগমায়া দেবী। তাঁদের পরিবার মূলত হুগলি জেলার জিরাট-বলাগড় অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। পিতার কাছ থেকে তিনি বিদ্যাচর্চার অনুপ্রেরণা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা লাভ করেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাত্রজীবন থেকেই অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। তিনি Presidency College থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯২৪ সালে আইন পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান লাভ করেন।

অল্প বয়সেই তিনি University of Calcutta-এর বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে যুক্ত হন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন, যা সে সময়ে একটি বিরল ঘটনা ছিল। তাঁর উপাচার্যত্বকালে শিক্ষার প্রসার, ভারতীয় ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাঁর অনুরোধে Rabindranath Tagore কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত রচনা করেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথমে শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং A. K. Fazlul Huq-এর মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (১৯৪১-১৯৪২)।

এই সময়ে তিনি বাংলা ও বাঙালির স্বার্থরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। কবি Kazi Nazrul Islam আর্থিক সংকটে পড়লে তিনি তাঁকে সহায়তা করেন এবং

চিকিৎসার জন্য মধুপুরে থাকার ব্যবস্থাও করেন। নজরুল তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন।

বাংলা বিভাজন ও পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা

প্রথমদিকে তিনি ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেন যে অবিভক্ত বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে পারে। তাই তিনি পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবিতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

৬ এপ্রিল ১৯৪৭

আমার চোখে পশ্চিমবঙ্গ

শ্রেয়া মন্ডল (ষষ্ঠ পর্যায়, সংগীত বিভাগ)

পশ্চিমবঙ্গ আমার কাছে শুধু একটা রাজ্যের নাম নয়, এটা আমার নিজের একটা অনুভূতি। এই মাটিতে জন্মেছি, বড় হয়েছি, এখানকার মানুষ, পরিবেশ, উৎসব, আনন্দ-কষ্ট সবকিছু কাছ থেকে দেখেছি। তাই পশ্চিমবঙ্গকে আমি শুধু মানচিত্রে দেখি না, আমি দেখি মানুষের জীবনের মধ্যে, গ্রামের মাটির গন্ধে, শহরের ব্যস্ততার মধ্যে, উৎসবের আনন্দে আর প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গটা সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর একটা জায়গা। একদিকে উত্তরে পাহাড়, আরেকদিকে দক্ষিণে সমুদ্র। দার্জিলিংয়ের পাহাড় আর চা-বাগান দেখলে মনে হয় প্রকৃতি নিজের হাতে সাজিয়েছে। আবার সুন্দরবনের দিকে গেলে অন্যরকম একটা অনুভূতি হয়। নদী, জঙ্গল, গাছপালা, বাঘ, হরিণ, নানা পাখি সব মিলিয়ে মনে হয় আমরা কত বড় একটা প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বাস করছি।

ছোটবেলা থেকে গ্রামের দিকে তাকালে যে দৃশ্যটা চোখে পড়ে-সবুজ ধানক্ষেত, পুকুর, গাছের ছায়া, মাঠে কাজ করা মানুষ-এসবও পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় পরিচয়। আবার শহরের দিকে গেলে কলকাতার ব্যস্ত রাস্তা, পুরোনো বাড়ি, বইয়ের দোকান, ট্রাম, সংস্কৃতির চর্চা-সব মিলিয়ে একটা আলাদা ছবি দেখা যায়। একই রাজ্যের মধ্যে এত রকমের জীবনযাত্রা আছে, এটাই পশ্চিমবঙ্গের বড় সৌন্দর্য।

আমাদের রাজ্যের মানুষও খুব আলাদা ধরনের। বাঙালি একটু আবেগী জাতি। আমরা আনন্দ করতে ভালোবাসি, গল্প করতে ভালোবাসি, গান শুনতে ভালোবাসি, আড্ডা দিতে ভালোবাসি। অনেক সময় বলা হয় বাঙালি নাকি অলস। সত্যি বলতে গেলে, আমাদের মধ্যে একটু আরামপ্রিয় ভাব আছে। ছুটির দিনে একটু দেরি করে ওঠা, চায়ের কাপ হাতে গল্প করা, পাড়ার মোড়ে বসে আলোচনা করা-এসব বাঙালির

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলা বিধানসভার ভোটাভুটির মাধ্যমে বাংলা বিভাজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকের মতে, পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষায় তাঁর অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন যে ৫৮ জন-

কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল বীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিমল চন্দ্র সিং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মোহিনী মোহন বর্মন হেমন্ত কুমার বসু জ্যোতি বসু সতীশচন্দ্র বসু রতনলাল ব্রাহ্মণ খগেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত কানাইলাল দাস কানাই লাল দে হরেন্দ্র নাথ দলুই সুকুমার দত্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় অরবিন্দ গয়েশ একে যোষ বিমলকুমার ঘোষ ডি গোমস ডম্বর সিং গুরুং রাজেন্দ্র নাথ সরকার দেবেন্দ্র নাথ সেন মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী কুমারী বীণা দাস রাধা নাথ দাস দেবীপ্রসাদ খৈতান চারুচন্দ্র মোহান্তি অর্ধেন্দুশেখর নস্কর উদয়চাঁদ মহতাব নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি বিষাপতি মাঝি ভূপতি মজুমদার ঈশ্বরচন্দ্র মাল আশুতোষ মল্লিক অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল বন্ধুবিহারী মণ্ডল মুকুন্দবিহারী মল্লিক বাসন্তীলাল মুরারকা ঈশ্বর দাস জালান যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা এল আর পেন্টনি আর ওয়াই প্লেটেল আনন্দীলাল পোদ্দার রজনীকান্ত প্রামাণিক কমলকৃষ্ণ রায় যোগেশ্বর রায় শ্রীমতি ই এম রিকেটস জিসিডি উইলকস কালীপদ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ গঠনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন যাঁরা-

আব্দুল আহাদ আব্দুর রহমান আব্দুস সবুর খান আবুল হাশেম হুসন আরা বেগম ইলিয়াস আলি মোল্লা
এমএএইচ ইস্পাহানি জসিমউদ্দিন আহমেদ মহম্মদ শরিফ খান মোজাম্মেল হোসেন মহম্মদ ইদ্রিস

তিনি বিখ্যাত স্লোগান দেন— "এক দেশে দুই বিধান, দুই প্রধান ও দুই নিশান চলবে না।" সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও পারমিট ব্যবস্থার বিরোধিতা করে তিনি আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে প্রবেশের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর কাশ্মীরে বন্দি অবস্থায় ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক রয়েছে। অনেকেই তাঁর মৃত্যুকে রহস্যজনক বলে মনে করেন এবং বিষয়টি নিয়ে নানা রাজনৈতিক আলোচনা আজও বিদ্যমান।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, প্রশাসক, শিল্পোন্নয়নের রূপকার এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অন্যতম প্রধান মুখ। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে তাঁর অবদান ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর কর্মজীবন প্রমাণ করে যে শিক্ষা, প্রশাসন ও রাজনীতি—তিন ক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও আদর্শ আজও বহু মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস।

মুশারফ হোসেন মহম্মদ কামরুদ্দিন মহম্মদ রফিক কে নুরউদ্দিন সিরাজউদ্দিন আহমেদ সৈয়দ মহম্মদ সিদ্দিক
এইচএস সুরাবর্দী এএমএ জামান মুদাসির হোসেন আব্দুল ওয়াহিদ সরকার

এর পর তৃতীয় ভোটাভুটি হয় হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যদের নিয়ে। প্রস্তাব ছিল পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে পৃথক পশ্চিমবঙ্গ গঠন। হিন্দু সদস্যদের ভোটে পাশ হয়ে যায় প্রস্তাব। ভোটাভুটির ফল ছিল ৫৮-২১। তৃতীয় ভোটাভুটিতে পৃথক পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে একজোট হয়ে ভোট দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতি বসু। নথি বলছে, পৃথক পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই হিন্দু বা অমুসলিম। অন্যদিকে, এই প্রস্তাবের বিপক্ষে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই আইনসভার মুসলিম সদস্য। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কারা কারা পৃথক পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এবং কারা বিপক্ষে।

স্বাধীনতার পর তিনি জহরলাল নেহেরু-র মন্ত্রিসভায় ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি দেশের শিল্পোন্নয়নে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তাঁর উদ্যোগে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, সিন্ধ্রি সার কারখানা এবং বিভিন্ন শিল্পোন্নয়ন প্রকল্প গড়ে ওঠে। খড়্গপুরে Indian Institute of Technology Kharagpur প্রতিষ্ঠার ভাবনাতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দেশের শিল্পায়নের ভিত্তি নির্মাণে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা

১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে তিনি Bharatiya Jana Sangh প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলই পরবর্তীকালে ভারতের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল Bharatiya Janata Party-এর পূর্বসূরি হিসেবে পরিচিত। তিনি জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও দেশের অখণ্ডতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন।
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার বিরোধিতা। তিনি মনে করতেন, একটি দেশের মধ্যে পৃথক সংবিধান, পৃথক পতাকা ও বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেশের ঐক্যের পরিপন্থী।

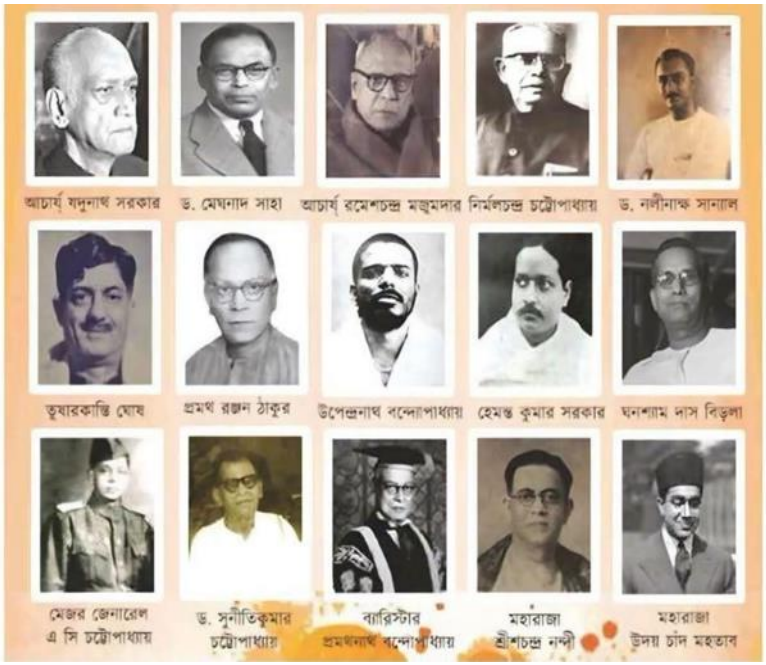

শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে পন্ডিতবর্গ, হিন্দুদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠনে সমর্থন করেন।